বদ্‌রুজ্জামান চৌধুরী

বদ্‌রুজ্জামান চৌধুরী (১.৯.১৯৪৬—) আসামের করিমগঞ্জ জেলার বদরপুরের কাছে মালুয়া গ্রামে বাস করেন। প্রবীণ এই গল্পকার; তাঁর চারপাশে ঘিরে রয়েছে সাধারণ অর্ধশিক্ষিত, না-শিক্ষিত, কৃষক-শ্রমজীবী, হত-দরিদ্র মানুষ। এমনই একটি পরিমণ্ডলে থেকে বিশেষভাবে মুসলিম জনমানসকে, তাদের সামগ্রিক জীবনাচরণকে প্রত্যক্ষ করার সুযোগ পেয়েছেন তিনি। এদের জীবনযুদ্ধের তীব্রতা, হৃদয়ের ব্যথা-বেদনাপূর্ণ তীব্র জীবনযুদ্ধের স্বরূপ বদ্‌রুজ্জামান চৌধুরীর গল্পে গভীর ছাপ ফেলেছে। একই সঙ্গে তাঁর রচিত গল্পগুলোতে সমাজ ও অর্থনীতির প্রভাব যেমন স্পষ্টতা পেয়েছে, তেমনি বাস্তব অর্থেই গল্পগুলো হয়ে উঠেছে নিম্নবর্গের পাঠকৃতি। তাঁর একটি গল্পগ্রন্থ হল 'লাখ টাকার মানুষ' (২০০৩)।

'লাখ টাকার মানুষ' গল্পগ্রন্থের প্রথম গল্পটি হল **'জানোয়ার'** (রচনাকাল একুশ জুন, ১৯৭৭)। নামকরণের মধ্যেই গল্পের ব্যঞ্জনার আভাস লক্ষণীয়। গল্পে রয়েছে একটি কাহিনি, যে কাহিনি গল্পকার এই সমাজ থেকেই সংগ্রহ করেছেন। বিত্তবানের দ্বারা ধনহীন দুর্বলের উপর নির্যাতনের একটি দৃষ্টান্ত এ গল্পের বিষয়। দরিদ্রের শ্রমের বিনিময়ে উপার্জিত ধন কায়দা-বলে অপহৃত হবার ফলে দরিদ্রের সংসারের স্বরূপটিও এখানে অস্পষ্ট থাকে না। পনেরোটি রিক্‌সার মালিক হাজি নঈমুদ্দীন আছিম শেখের সারা দিনের রোজগার নিজের কব্জায় নিয়ে নিচ্ছে। এ হল গল্পের একটি দিক। রোজগারের অর্থ ঘরে না নিতে পারার ফলে আছিম শেখের সংসারের দুরবস্থা কত গভীরে পৌঁছাতে পারে, তা হল গল্পের দ্বিতীয় অংশ। গল্প পাঠের পর পাঠক অনুভব করেন। কেন গল্পের নাম হল 'জানোয়ার'।

হাজি নইমুদ্দীন ধনবান ব্যক্তি, পোশাক-আশাকে বিলাসী। মাথা ঢাকা থাকে নক্‌শি চাদরে, পায়ের গোড়ালি পর্যন্ত ঢাকা থাকে, এমন জোব্বা পরিধান করে। ছয়জনের পরিবারের জন্য চাকর-বাকর রয়েছে আরো ছয়জন। আর রিক্‌সাই তার একমাত্র আয়ের উৎস নয়। ধান জমি রয়েছে, রয়েছে বেনামী সুদের কারবার। তাছাড়া দুবার হজ সেরে এসে সে পুণ্যবানের ডিগ্রি লাভ করেছে। অন্যদিকে নঈমুদ্দীনের রিক্‌সা ভাড়া নিয়ে রোজগার

Scanned with CamScanner

করে আছিম শেখ। তার অভাব ঘোচে না। উপোস করে তাকে রাস্তায় নেমে আসতে হয় রিক্সা চালাতে। ফতেমা বিবি তিন সন্তানের জন্ম দিয়েছে, কিন্তু তার মধ্যে একটি মরে গেছে, বাকি দুটো কোনো মতে টিকে রয়েছে। সর্বত্র অভাবের ছাপ, চরম দারিদ্র্য আছিম আর ফতেমার সংসারে। ফলে, রিক্সা চালিয়ে যে রোজগার হয় তা দিয়ে নইমুদ্দীন তার পুরনো ঋণই শোধ করতে পারে না। তাই তার সংসারে সর্বগ্রাসী অভাব হা করে থাকে।

যেদিনের রোজগার থেকে সামান্য কিছুটা আলাদা করে রেখে দেবে স্থির করেছিল আছিম শেখ, সেদিনই নইমুদ্দীন ঘোষণা দিল : "...কাল আমার রিক্সা তুই পাবি না। অন্য ড্রাইভার আমার দেখা আছে।" অর্থাৎ এ একেবারে রোজগারের উৎসে আঘাত। তাহলে আছিমের দেহটাই রক্ষা হবে না। তাছাড়া, নইমুদ্দীনের এরকম সিদ্ধান্তের অন্য কারণও রয়েছে। আছিমের চাচাতো ভাই ছৈয়দ তার জমিটা নইমুদ্দীনের কাছে বিক্রি না করে পীতেশ পালের কাছে বেঁচে দিয়েছে। সুতরাং এ যে আছিমেরই অপরাধ, তা প্রমাণ করে ছেড়েছে নঈমুদ্দীন। এমনই অবস্থা আছিমের যে, আগামী দিন রিক্সা পাবে না ভয়ে নঈমুদ্দীনকে রোজগারের সব টাকাই দিয়ে এসেছে।

নঈমুদ্দীনের সঙ্গে সাবের মিয়ার ভালো সম্পর্ক। কারণ, "সাবের মিয়া পাশের গ্রাম নয়াপত্তনের ছোটোখাটো জোতদার গোছের লোক।" যে লোকটি রিলিফের আটা-চাউল চুরি'র কাজে অভিযুক্ত, সেই সাবের মিয়ার সঙ্গে সুসম্পর্ক রক্ষা করে চলে নঈমুদ্দীন। তার একটি বিশেষ কারণ হল, সাবের মিয়া আসন্ন সমবায় সমিতির নির্বাচনে চেয়ারম্যান পদের জন্য ভোটে দাঁড়াবে। আসলে, এসব বড়োলোকদের হাতেই রয়েছে সমাজ পরিচালনার যাবতীয় চাবিকাঠি। আছিমের যে পুরনো ঋণ পরিশোধ করা উচিত, এমন অভিমত সবাই সমর্থন করে। নঈমুদ্দীন যেহেতু হজ ফেরতা, তাই আল্লার দোয়ায় সে মিনিটে মিনিটে পূণ্য সঞ্চয় করে। "বেকির খাতায় তা লিখতে লিপিকর ফেরেশতারা হিমসিম খেয়ে যায়।" গোকুল দাসও আছিমের কাছে থেকে বাকি দু'টাকা আদায় করে নেয়।

আছিমের শ্রমের বিনিময়ে উপার্জনের সবটাই যখন মালিক-মহাজনেরা খেয়ে নেয়, তখন সে নিজে এবং পরিবারের সদস্যরা অভুক্ত থাকবে, এতে আর আশ্চর্য কী! এ পর্যন্ত গল্পের একটি ভাগ; বহুভাবে নানা গল্প-উপন্যাসে এমন অভাব, দারিদ্র্য, দুঃখময় জীবন-যাপনের ভাষ্য স্থান করে নিয়েছে। কিন্তু হাজি সাহেবরা তো 'নেক্ দিল ইনসান্'। অথচ যে মানুষটি তার পরিবার নিয়ে অভুক্ত দিন কাটাচ্ছে; এসব জেনে বুঝেও তাকে কোনো ভাবে সাহায্য-সহায়তা করার মানসিকতা নেই নঈমুদ্দীনের। নিজে যে ন্যায়ের পথ ধরে চলছে, এ বিশ্বাস রয়েছে তার। এই ছকটি নতুন নয়, এমনকী না খেতে পেয়ে আছিমের সন্তান বাদশার মৃত্যুর ঘটনাটিও গল্পের গতির সঙ্গেই সঙ্গতিপূর্ণ। কিন্তু গল্প শেষ হয়ে যায়নি।

Scanned with CamScanner

আছিম কোলের সন্তান বাদশার অসুস্থতা নিরাময়ের জন্য এক বিন্দু ওষুধ এনে দিতে পারেনি। নির্জীব বাদশা পায়নি এক ফোঁটা বুকের দুধও। একসময় অবধারিতভাবে তার পুত্র বাদশার মৃত্যু হল। এরপরই তো তাকে কবরস্থ করার পালা। মৃত্যুর পর তো আল্লার ঘরেই যায় মৃতের আত্মারা। প্রাণ সম্পন্ন মানুষের প্রাণ রক্ষার জন্য যে নঈমুদ্দীনের হাত উপুড় হয়নি, এবার সে এগিয়ে আসে কাফনের খরচা মেটাবার জন্য। যে নঈমুদ্দীন সারা দিনের রোজগার কেড়ে নেয় নাজিমের হাত থেকে, শুধু আল্লার নজরে ভালো হবার জন্য নঈমুদ্দীন দিয়ে দেয় পাঁচ-পাঁচটি টাকা। এটা অবাক হবার মতোই ঘটনা নিঃসন্দেহে। এই পরিস্থিতিকে গল্পকার যে ভাষায় উপস্থাপন করলেন :

> "হাঁজি নঈমুদ্দীন পাঁচটা টাকা আছিমের দিকে বাড়িয়ে দিল, দুঃখ করে লাভ নেই আছিম, আল্লার মাল আল্লা নিয়েছে। হাশরের দিনে তোমাকে জান্নাতে নেবার সুপারিশ করবে আল্লার কাছে। খুশ্ কিস্মৎ তোমার। কাফনের জন্য পাঁচ টাকা খয়রাত দিচ্ছি, খয়রাতে বেহশ্তের দরজা খোলা রাখে।"

নঈমুদ্দীনেরা যা করে তার নেপথ্যে থাকে স্বার্থবোধ। একাল ও পরকালে কোনো কালেই সে হীন অবস্থায় থাকতে চায় না। মৃত্যুর পরেও রয়েছে এক জগৎ। সেখানে আল্লার দখলদারী চলে। সেখানে সবাইকে একদিন না একদিন হাজিরা দিতে হবে। তাই আরেক মৃতের জন্য দান-খয়রাত করে বেহশ্তের পথ মসৃণ করার লক্ষ্যে এই প্রচেষ্টা।

কিন্তু এরপরই গল্পশরীরে যে মোচড় এসেছে, তা গল্পকে শিল্পচূড়ায় পৌঁছে দিয়েছে। যে আছিম বেঁচেও মরে আছে, তার এভাবে হঠাৎই পাঁচটি টাকা পেয়ে যাওয়া এক কথায় অকল্পনীয়। স্বভাবতই তার মনে হয়েছে, এমন বাদশা তাদের ঘরের আরো জন্ম নিক্, তাহলে নঈমুদ্দীনের মত পরকাল নিয়ে ভাবিত লোকেরা হাতে টাকা নিয়ে আসবে। জ্যান্ত মানুষের জন্য যারা ভাবে না, মৃতকে নিয়েই যাদের ভাবনা তাদের সামনে আরও মৃত বাদশা হাজির হোক্। তাহলে, আছিমের মতো মানুষদের অন্তত উপোস্ করে দিন কাটাতে হবে না। গল্পকারের জবানীতে পরিস্থিতিটি অসাধারণত্ব পেয়েছে।

> "তাকে (আছিমাকে) উদোম করে আষ্টে পৃষ্টে জড়িয়ে ধরেছে আছিম। ফিস্ ফিস করে বলল, আরেকটা বাদশা তৈরি করতে চাইরে পতেমা, আরেকটা বাদশা। নইলে হাজি নঈমুদ্দীন কার কাফনের জন্য আবার পাঁচ টাকা খয়রাত করে এবং বেহেশতের টিকিট করবে?"

এক-একটি সন্তানের অকাল মৃত্যুর কারণে রোজগার হবে পাঁচ-পাঁচটি টাকা। মাথার ঘাম পায়ে ফেলে, অভুক্ত থেকে যে আছিম গ্রাসাচ্ছাদনের ব্যবস্থা করতে পারে না, নিছক মৃত্যুকে কেন্দ্র করে হাতে অর্থ এসে যায় তার। আছিমের কাছে এ এক বিস্ময়কর আবিষ্কার। এহেন অনুভূতি আছিমকে উন্মত্ত করে তোলে। ধনবান মানুষেরা ধন-সম্পদের জোরে ইহকাল পরকালের সব আরাম সুযোগ-সুবিধা কিনে নিতে চায়। গল্পে ধর্মীয় সংস্কার

Scanned with CamScanner

মানুষকে কোন্ অবাক করা জগতে উপনীত করতে সক্ষম, তারই বিশ্বস্ত প্রতিবেদন হয়ে উঠেছে এই গল্প। সমাজে অর্থনৈতিকভাবে স্বচ্ছল মানুষেরা শ্রমজীবী নিরন্ন মানুষদের যে দৃষ্টিতে দেখে তা এখানে আভাসিত করেছেন গল্পকার। একই সঙ্গে গ্রামীণ অর্থনৈতিক নড়বড়ে বাস্তব অবস্থাটিও বিশ্বাসযোগ্যভাবে এ গল্পে উপস্থাপিত হয়েছে। বরাকভূমিতে বসে গল্পকার এই গল্প রচনা করলেও এটি হয়ে উঠেছে গ্রামীণ সমাজ ও অর্থনীতির সর্বভারতীয় প্রতিবেদন। মুসলমান অথবা হিন্দু দুই ধর্মীয় সমাজের মানুষের জন্য এরূপ অবস্থার কোনো ব্যতিক্রম নেই।

বদরুজ্জামান চৌধুরী লেখা একটি গল্প হল '**কেচ্ছা**' (রচনাকাল : সতেরো অক্টোবর, ১৯৯০)। ধর্মীয় স্থবিরত্ব বনাম দুনিয়ার গতিশীলতা এবং মুসলমান সমাজে নারীদের অবস্থানকে কেন্দ্র করে একটি অসামান্য গল্প এটি। এ এমনই এক কেচ্ছা বা কিস্‌সা অথবা গল্পকথা, যার বিষয় সমাজের বুকে বাস্তব। গল্পের উপস্থাপনার ঢংটিও চমৎকার। যে মোল্লাজি মসজিদে ইমামগিরি করে দিন গুজরান করার কথা, তিনিও এখন ছাত্র পড়ানোর কাজ নিয়েছেন। কেননা "তেল, পানিপড়া, তাবিজ ঝাড়-ফুঁক এ'সবের দিন ফুরিয়ে আসছে।" যেহেতু মানুষের ইমান নষ্ট হয়ে গেছে, তাই তারা আর এসবে আস্থা রাখে না।

স্পষ্টতই, মোল্লাজি তার ধর্ম আচরণকে শ্রদ্ধা করেন, এর উপর তার অটুট আস্থা। তাই ছাত্রীর হিন্দুয়ানি-নাম লীলা চৌধুরী তার না-পসন্দ। দেয়ালে ছবি রাখা না-জায়েজ, তাই তিনি তার থেকেও লম্বা দাঁড়ি যার, এমন একজন ব্যক্তির ছবি উল্‌টে দিয়েছেন। তারই ছাত্রী লীলা সেই লোকটির কয়েকটি কবিতা আবৃত্তি করে শুনিয়েছিল মোল্লাজিকে। পরের দিন পূর্বাবস্থায় ছবিকে দেখে, বাড়ির কাজের লোকের মুখে ছবির অবস্থান ঠিক থাকবে জেনে মোল্লাজি মনে মনে বিরক্ত হলেন। তার মনে হল "টাকা আর বেদ্বীনি শিক্ষার গরবে লোকগুলোর ইমান নষ্ট"। কিন্তু ছাত্র পড়ানোটা তিনি ছাড়তে চান না বলে মুখে কিছু প্রকাশ করেন না। এভাবেই ধর্মীয় বিশ্বাস-সংস্কারে আষ্টে-পৃষ্ঠে মোড়ানো মোল্লা সাহেবকে গল্পকার বিশিষ্ট চরিত্র হিসেবে তাঁর গল্পে প্রতিষ্ঠা দিয়েছেন।

হাসানের একমাত্র সন্তান লীলা। তাকেই আরবী পড়ান মোল্লাজি। হাসান বড়ো চাকরি করে। বয়েস যদিও পয়ত্রিশ, অথচ তাকে দেখলে মনে হয়, তার বয়স চল্লিশ থেকে পঁয়তাল্লিশ হবে। বয়সের তুলনায় বুড়িয়ে যাওয়া কী তার ভেতরে ঝড়ে যে ভাঙন ধরেছে, তারই ফলশ্রুতি ? গল্পকার কি পাঠককে এমনই একটি পরিস্থিতির দিকে ঠেলে দিচ্ছেন ? হাসান মোল্লা সাহেবকেই তার জীবনের গল্প বলার জন্য নির্বাচন করে নিয়েছেন। হাসান তার মায়ের জীবনের গল্প শোনাচ্ছেন মোল্লাসাহেবকে। আর তারই সূত্র ধরে মুসলমান সমাজে নারীদের চরম দুর্দশা ও নির্যাতনের ধারাবাহিক ইতিহাস একটু একটু করে উন্মোচিত হয়েছে।

গোটা গল্পটি আসলে হাসানের মা'কে কেন্দ্র করেই এগিয়েছে। গল্প ডালপালা মেলেছে

Scanned with CamScanner

সত্য, কিন্তু কেন্দ্র থেকে তা বিচ্যুত হয়নি। এক পুরুষের সংসার থেকে আরেক পুরুষের সংসারে ক্রমাগত হাসানের মাতৃদেবীর ঠাঁই হয়ে চলেছে। কিন্তু পুরুষ তার সংসারের প্রয়োজন সিদ্ধ করার জন্যই এই নারীকে সংসারে স্থান করে দিয়েছে। কাজ-প্রদানকারী যন্ত্র হিসাবে এই নারী এক স্থান থেকে অন্য স্থানে গেছে। প্রথমবার হাসানের পিতৃদেব তিন তালাক দিয়েছিলেন তার মাকে। এ সম্পর্কে মুসলিম সমাজে স্বামীস্ত্রীর বন্ধন সম্পর্কে গল্পকারের মন্তব্য উল্লেখ করা যেতে পারে।

> "...কি দৈহিক, কি মানসিক—স্বামী-স্ত্রীর সম্পর্ক লৌকিক পারলৌকিক সময়ের সীমাহীন কালাকালকে অতিক্রম করে যায় আমাদের শেখানো বিশ্বাসে। অথচ মাত্র তিনটে কথা, তিন সেকেন্ডও নয়—তা' তাসের প্রাসাদের মতো হুড়মুড় করে ভেঙে পড়ে।"

প্রথমবার হাসানের পিতৃদেব হাসানের মাকে তালাক দিলে মামারা এসে তাকে নিয়ে যায়। বড়ো মামার সন্তানদের সেবা যত্ন এবং বড়ো করে তোলার জন্য তার মায়ের ভূমিকা ছিল অপরিহার্য। ছ'টি সন্তানের জন্মদাতা হবার পর একদিন যখন বড়োমামাটির মৃত্যু হয় তখন দ্বিতীয়বারের মতো তার ঠাঁই হয় সত্তর বছরের এক অথর্ব বৃদ্ধের ঘরে। বৃদ্ধটি আবার কেন্সার রোগাক্রান্ত। এর ফলে বহুমুখী স্বার্থ রক্ষিত হল। বুড়োর উকিল ছেলে বুদ্ধিমান। মামারা বুড়োর কাছে থেকে বিয়ের খরচা বাবদ ছয় হাজার টাকা রোজগার করে নিল। আবার হাসানের মায়ের পণ্যমূল্য ধার্য করা হল দু'হাজার টাকা। কিন্তু বৃদ্ধের সেবা করাই ছিল সেই নারীর কাজ।

হাসান শুধু ধর্মীয় অনুশাসন এবং আইনী জটিলতার কারণে নিজের মা'কে নিজের আশ্রয়ে নিয়ে আসতে পারেনি। আজ যখন মাকে বৃদ্ধের উকিল-পুত্রের নিকট থেকে মুক্ত করে আনতে পেরেছে, তখন মা তার ক্লান্ত রিক্ত মানুষের কাঠামো মাত্র। তা-ও বৃদ্ধের উকিল পুত্রের কাছে ছাড়পত্রের হুকুমনামায় সই দিয়ে আসতে হয়েছে। কেননা, অন্যথায় "বুড়োর ফেলে যাওয়া স্থাবর-অস্থাবরের একটা অংশের মালিকান হয়ে যেতো যে সেই ক্রীতদাসী।"

স্পষ্টতই গল্পকার বদরুজ্জামান চৌধুরী মুসলমান সমাজের নারীদের অবস্থানে দাঁড়িয়ে নারীদের প্রতি দৃষ্টিক্ষেপ করেছেন। তাদের প্রতি ধর্মের দোহাই দিয়ে শত শত বছর ধরে চলে আসছে এমন নির্যাতন। গল্পের সর্বাঙ্গে নারীদের প্রতি ধর্মের নামে সামাজিক নির্যাতন এমন স্পষ্ট ভাষায় বলার মতো সাহস রয়েছে গল্পকারের। মুসলিম সমাজ ধর্মীয় অনুশাসনে নিয়ন্ত্রিত হয়। রাষ্ট্রীয় আইনের সমান্তরালে সেটি এগিয়ে চলে। নারীদের বন্দী বানিয়ে রাখার যাবতীয় রাস্তাগুলো সেখানে উন্মুক্ত। প্রয়োজনে তাদের সঙ্গে যাবতীয় সম্পর্কের সূত্রগুলো মুহূর্তে বিচ্ছিন্ন করে ফেলা যায়। পুরুষেরা এবং ধর্ম পরিচালক প্রভুরাই এর নিয়ন্ত্রক। মুসলিম নারীরা যে পুরুষ শাসিত সমাজে ক্রীতদাসী, তা বোঝাতে তিনি 'আঙ্কল

Scanned with CamScanner

টমস্ কেবিন' গ্রন্থটির নাম উচ্চারণ করেছেন।

মুসলিম সমাজে নারীরা যে কতভাবে নির্যাতিত হয়, তা জানাতে গিয়ে গল্পকার হাসানের মায়ের প্রসঙ্গ নিয়ে এসেছেন এখানে। তালাক উচ্চারণে কীভাবে সংসারের প্রতি নারীর যাবতীয় বন্ধন ছিন্ন হয় এক লহমায়, তা গল্পকার দেখিয়েছেন। এখানে নারীদের কাছে পুরুষ তার অদৃষ্টের মালিক। হাসানের মা-নারীটির এক বাঁদি-দাসীর মতো বাকি জীবনটি অতিবাহিত হয়েছে। মুসলমান সমাজে এ হল নারীদের বাস্তব অবস্থা। এই অমোঘ প্রক্রিয়া থেকে মুসলিম নারীদের সহসা মুক্তি নেই। নারী নিজের দুঃসময়ে মাথা গোঁজার মাটিটুকুও হারায়, তার মালিক হয়ে যায় কোনো না কোনো পুরুষ। এমনই একটি ভয়ঙ্কর সামাজিক সংকট গল্পকার অত্যন্ত সাহসের সঙ্গে গল্পে উপস্থাপন করেছেন।

প্রশ্ন হল, গল্পের বক্তা হাসান মোল্লা সাহেবকে কেন তার দুঃখ মেশানো বক্তব্য শোনালেন? নারীদের এভাবে যাবতীয় সুখ সুবিধা বঞ্চিত করে সমাজের ক্রীতদাসী বানিয়ে হাসান, মোল্লাসাহেবকে নয়, বরং ইসলাম ধর্মের কাছে, নারীদের এভাবে অবরুদ্ধ করে রাখার বিরুদ্ধে প্রশ্ন উত্থাপন করেছেন গল্পকার।

গল্পকার বদরুজ্জামান চৌধুরী **'মানুষ'** (রচনাকাল : ষোলো জানুয়ারি ১৯৮২) গল্পে মানুষের প্রকৃত স্বরূপ কী হতে পারে, তা নিয়ে জটিল এক প্রশ্নের মুখোমুখী হয়েছেন। একটি ভিখিরি পরিবার, তাদের রোজনামচা এই গল্পের মুখ্য বিষয়। রাজ্জাক আর পাতাবিবি, তাদের চারটে বাচ্চা-কাচ্চা। একটি কোলে রয়েছে, আর তিনটে বাচ্চা ভিক্ষে করে। রাজ্জাক রিকসা চালাতে চালাতে রক্ত বমি করে অসুস্থ এখন। তাই সে বসে বসে খায়। যে পরিবারের এহেন হাল, সেখানে কোলের শিশু বুকের দুধ পাবে না, এতে আশ্চর্য কী! তার সংসারের কোনো শিশুই স্বাস্থ সম্পন্ন হবে না,এটাও স্বাভাবিক ঘটনা। তবু তাদের প্রত্যাশা সন্তানেরা ভিক্ষা করতে বেরিয়ে কিছু না কিছু খেতে পারবে। কেউ না কেউ কিছু খেতে দেবে তাদের।

রিকসা-চালক রাজ্জাকের বাচ্চাগুলো ভিক্ষে করে কিছু আনতে পারলেই তাদের গ্রাসাচ্ছাদন হয়। প্রকৃতি যখন অনাবৃষ্টিতে মাঠের ফসল নষ্ট করে দেয়, তখন উদ্বৃত্ত খাদ্যও থাকে না মানুষের ভাঁড়ারে। বাচ্চাগুলো কোনোদিন মানুষের বাড়িতে কিছুই খেতে পায় না বা ভিক্ষে পায় না, এমনও হয়। এভাবেই দারিদ্র্য পীড়িত একটি পরিবারের চিত্র গল্পকার এখানে তুলে ধরেন। বিপ্রতীপে অবস্থাসম্পন্ন মানুষদের কথাও যে এখানে বলেন না, তা নয়। দরিদ্র রাজ্জাক পরিবার মাঝে মধ্যে চুরিও করে। সুপারি, আলু, ক্ষিরা ঝিঙে তুলে আনে জমি থেকে। কিন্তু ভালো করে চুরি করতে জানলে যে ভালো থাকা যেত তা তারাও জানে। হরি চক্রবর্তী অন্যকে ঠকিয়ে জমি হাতিয়ে নেয়—এসব করে ফুলে ফেঁপে উঠছে চক্রবর্তীর সংসার। এও বেশ বড়ো আকারের চুরি ছাড়া কিছু নয়। এভাবেই সমাজের দুই

Scanned with CamScanner

শ্রেণির মানুষের স্পষ্টতা দিলেন গল্পকার।

বর্তমান গল্প থেকে এ পর্যন্ত যে বিষয়গুলো অবলম্বনে পাঠক একটি প্রাপ্তির জগতে পৌঁছুতে পারেন তা হল : গল্পের নিম্নবর্গীয় এবং উচ্চবিত্ত মানুষদের অবস্থান চিহ্নিত করলেন গল্পকার। একই সঙ্গে হিন্দু ও মুসলমান এবং ধনী-দরিদ্রের একই বৃত্তে অবস্থানের চিত্রটি অত্যন্ত স্পষ্ট। কিন্তু অভাব যখন চরমে পৌঁছায়, তখন মানুষ কোন্ প্রাগৈতিহাসিক স্তরে পৌঁছে যেতে পারে, তারই একটি অসাধারণ চিত্র রয়েছে গল্পটিতে। রাজ্জাক আকাশে শকুনের ওড়াউড়ি দেখেছিল। গল্প-চমকের বীজটি এখানেই লুকিয়ে রয়েছে। রাজ্জাকের ভিখারি সন্তানগুলো কাক-শকুনের ভীড় ঠেলে বাড়ির দিকেই এগোচ্ছিল। কিন্তু ক্ষুধার তাড়নায় তারাও শামিল হয়েছিল কাক-শকুনের দলে।

বেলা ঢলে পড়ছে বলে রাজ্জাক ছেলেমেয়েদের সন্ধানে রাস্তায় বেরিয়ে পড়েছে। সে দেখেছে, তার তিন বছরের বাচ্চাটির মুখ বন্ধ রয়েছে। আর রাজ্জাকের প্রহারের চোটে তার মুখ থেকে বেরিয়ে পড়েছে 'এক টুকরো মাংস'। স্বভাবতই, যে মানুষ গরুর কাঁচা মাংস মুখে তুলে নিয়ে চিবোতে পারে সেখানে ক্ষুধার জ্বালা এবং দারিদ্র্যের তীব্রতা যেমন প্রকটিত হয়, তেমনি তারা আদৌ 'মানুষ' পদবাচ্য কিনা, এমন প্রশ্ন উত্থাপিত হতেই পারে। মানুষের চরম দারিদ্র্যকে শিহরণ জাগানো অনুভূতিতে পৌঁছে দিয়ে গল্পকার না-দেখা যে জীবন, তারই প্রতি অঙ্গুলি নির্দেশ করলেন।

'লাখ টাকার মানুষ' গল্পের নামেই বদরুজ্জামান চৌধুরী তাঁর গল্পগ্রন্থের নামকরণ করেছেন 'লাখ টাকার মানুষ'। দীর্ঘ একটি গল্প এটি। বরাক উপত্যকা জুড়ে যে মুসলমান সমাজ রয়েছে সেখানে নারীদের সামাজিক অবস্থান এবং পুরুষের চোখে নারীদের অবস্থান গল্পটিতে গুরুত্ব পেয়েছে। গল্পটির দীর্ঘতার কারণে, গল্পকার সেখানকার স্থানিক জলহাওয়ার কিছু স্বরূপও তুলে ধরার অবকাশ পেয়েছেন। গল্পের সঙ্গে সেসব উপাদান মিশে রয়েছে গভীরভাবে। গল্পে রয়েছে এক স্বচ্ছন্দ গতি। সমাজকে তিনি যেভাবে দেখেছেন, এখানেও সেই ভাবেই তা রূপায়িত করেছেন। পাঠক এখানে লক্ষ্য করেন, গল্পকার তাঁর চারপাশে ঘেরা সমাজকে কত গভীরভাবে পর্যবেক্ষণ করেছেন। ফলে 'লাখ টাকার মানুষ' গল্পটি হয়ে উঠেছে গল্পকারের অভিজ্ঞতারই নির্যাস।

গল্পকার বদরুজ্জামান চৌধুরী মুসলিম সমাজের চৌহদ্দীতে নারীদের সামাজিক অবস্থান উপস্থাপন করেছেন। নারীদের প্রতি ধর্মীয় নিষ্ঠুরতার তীব্রতা তিনি বার বার তাঁর গল্পে বৃহত্তর সমাজের চোখে আঙুল দিয়ে দেখিয়ে দিতে চেয়েছেন। তিনি চেয়েছেন, নারী-জীবনের বিভিন্ন দিকসমূহ যেভাবে পুরুষ আধিপত্যবাদীরা দখল করে রেখেছে, সভ্য সমাজ অন্তত তার দিকে একবার ফিরে দেখুক। সহজ বাক্যের গাঁথুনিতে সচেতন ভাবে, কখনো বা নির্মাণ-নৈপুণ্য দিয়ে, ব্রাত্য-অধম মুসলিম নারী সমাজের জীবনের বিবর্ণ-রামধনু আঁকতে

Scanned with CamScanner

প্রয়াসী হয়েছেন। বরাকভূমিকে প্রেক্ষাপট হিসেবে গল্পকার সেখানকার জীবনের যে চিত্র এঁকেছেন, তা ব্যতিক্রমধর্মী।

আসমানতারা পিতা কর্তৃক পরিত্যক্ত, কেননা আসমানতারার মায়ের মৃত্যুর পর তার পিতা আরেক বিয়ে করে চলে গেছে অন্যত্র। সুতরাং রেনুবুড়ি-নানির কাছেই থেকে একটু একটু করে বেড়ে উঠছে সে। তার পিতৃদেব আছেন, অথচ তাকে একদিনের জন্যও দেখতে আসে না বলে আসমানতারার মনে বেদনাবোধ রয়েছে। দুঃখ-সুখ, ভালোলাগা মন্দলাগার অনুভূতি আসমানতারা চরিত্রের একটি দিক। আর রেনুবুড়ি, বাড়ির সামনে এক চিলতে জমিতে শাক-সব্জি চাষাবাদ করে কোনো মতে দিন গুজরান করে। যেদিন বশীরের কাছে রেনুবুড়ি লাউ বিক্রি করল, লাউয়ের টাকা সংগ্রহের জন্য বশিরের বাড়ি গেল, সেদিনই বাড়িতে এল আসমানতারার পিতৃদেব ও বিদেশ ফেরত আব্দুছ সালাম, যে কিনা আসমান তারারই সৎ-ভাই। অন্যদিকে রেনুবুড়ি লাউবিক্রির টাকা নিতে এল বশীরের বাড়ি। একটু বেশি কথা বলার স্বভাব রয়েছে বলেছে বশীরের বউকে বলেছে "সোয়ামীরে ছাড়ি রাখোস্ কোন সাহসে, একটু দেখিটেখি রাখিস্, তোরে তো বলোনের দরকার দেখি না, এই বিদ্যা তো তোর পাশ করা—"। অনেকটা এই কথার উপর নির্ভর করেই বশীর আর তার পত্নীর মধ্যে শুরু হয়ে যায় বাক্ যুদ্ধ। এই বাক্য সংঘর্ষ শেষ পর্যন্ত সংসার ভাঙার অমোঘ পরিণতির দিকে এগিয়ে যেতে থাকে। এভাবে গল্পটিতে দুটি বিষয় দুটো পথ ধরে এগোতে থাকে। দুটো শাখা কাহিনি মিলে একটি পূর্ণাঙ্গ গল্প শরীর তৈরি হয়েছে।

অন্তজ মুসলিম জনজীবনে ধর্মের কঠোর-কঠিন অনুশাসনের গভীরতা এবং নারীদের সম্পর্কে মানুষের দৃষ্টিভঙ্গির স্বরূপ গল্পকার এখানে তুলে ধরেছেন। বশীর তার পত্নীর প্রতি ক্ষিপ্ত হয়ে বহুবার 'তালাক' উচ্চারণ করে তার মনের জ্বালা নিভিয়েছে। এর ফলে, মুল্লা-মুন্সিরা যে কতখানি সুবিধাবাদী পন্থা গ্রহণ করতে পারে, তা-ও গল্পে স্থান করে নিয়েছে। একটা সংসার যখন বিপদের মুখে পা বাড়ায়, তখন এই শ্রেণির মানুষেরা নিজেদের অর্থ ভাণ্ডার কীভাবে বাড়ানো যায়, তার ফিকির খোঁজে। একই সঙ্গে পুরুষ যখন 'তালাক' অস্ত্রের জোরে স্ত্রীকে বর্জন করে তখন তারই সন্তান-সন্ততিরা মায়ের সঙ্গ লাভ থেকে বঞ্চিত হয়। একজন সৎমা এসে এই সন্তান-সন্ততিদের প্রতি সুনজর না দেবার অকথিত রীতি চালু রয়েছে। ব্যতিক্রমও রয়েছে হয়তো।

দ্বিতীয় ক্ষেত্রে, রেনুবিবি যখন বশীরের বাড়িতে চলে এসেছে, এমন সময় রেনুবিবির বাড়িতে এল অসমানতারার পিতৃদেব এবং তারই সৎভাই আব্দুছ সালাম। যেহেতু আব্দুছ সালাম বিদেশে থাকে, তাই উপার্জনের বিচিত্র ফন্দি ফিকির তার জানা রয়েছে। নিজের পিতৃদেবকে এসব ব্যবসার কথা এবং অর্থ উপার্জনের দিকগুলো সে নিশ্চয় জানিয়েছে। ফলে পিতৃদেবটি এ ব্যাপারে প্রলুব্ধও হয়েছে। অথচ আশ্চর্য এটাই যে নিজের ঔরসজাত সন্তান বেচে দিতেও দ্বিধান্বিত নয় এই মানুষটি। একদিকে আসমানতারা যখন পিতৃদেবকে

Scanned with CamScanner

স্মরণ করে আবেগ আপ্লুত হয়, অন্তরে জমে ওঠে অভিমান, তখন এই মানুষটিই নিজের কন্যাকে মনে করে পণ্য, যার পণ্যমূল্য হয়তো হতে পারে লাখ টাকাও।

এখানে মুসলমান সমাজের অর্ধেক আকাশ নারীদের জীবনের ভারসাম্যহীনতার ছবি, হয়ে উঠেছে বাস্তবোচিত। অন্যদিকে, প্রশ্ন জাগে, এও কি সত্য যে পিতা নিছকই অর্থের লোভে তার ঔরসজাত কন্যাকে বিক্রি করে দিতে পারেন? গল্পকার বদ্‌রুজ্জামান চৌধুরী তাঁর 'লাখ টাকার মানুষ' গল্পে আসলে একটি দীর্ঘ কাহিনি আমাদের শুনিয়েছেন। তিনি সত্যদ্রষ্টা। স্পষ্ট ভাষণে সত্যকেই আলোকিত করেছেন তিনি। মুসলিম সমাজে ধর্মের দোহাই দিয়ে কীভাবে নারীদের পেষণ করা হয়, তারই জীবন্ত আলেখ্য গ্রন্থের গল্পগুলো। একই সঙ্গে নিম্নবর্গের মানুষদের জীবনের কথাও শুনিয়েছেন তিনি পাঠকদের। প্রশ্ন জাগে, এ কোন্ পৃথিবী; যারা চোখের জলই ফেলে প্রতিনিয়ত, তাদের বার্তা সভ্যসমাজকে আজো কেন আলোড়িত করে না!

Scanned with CamScanner